বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা কি অসম্ভব?

ড. এ কে এনামুল হক

দারিদ্র্য দূরীকরণের তাগিদ সর্বজনীন। সব দেশ, সব জনগোষ্ঠী চায়, তার সমাজ থেকে, দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর হোক। দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রচেষ্টাও বেশ পুরনো। ষাটের দশকে দক্ষিণ কোরিয়ার দারিদ্র্যের হার ছিল বাংলাদেশের মতনই। তারা দারিদ্র্য দূর করেছে সত্তরের দশকে। বর্তমানে কোরিয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হার শূন্য। সত্তরের দশকে মালয়েশিয়াও ছিল আমাদের কাছাকাছি। নব্বইয়ের দশকে তারাও দারিদ্র্যের হার প্রায় শূন্যে নামিয়ে এনেছে। ১৯৯০ সালে উন্নয়নশীল দেশের প্রায় ৪৭ শতাংশ জনগোষ্ঠী দরিদ্র ছিল। ২০১৫ সালে তা ১৪ শতাংশে নেমে এসেছে। বিশাল সাফল্য। কথা ছিল, নামানো হবে অর্ধেকে। অর্থাৎ ২৩ দশমিক ৫ শতাংশে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়েছে টার্গেট থেকে আরো প্রায় ১০ শতাংশ কম। অর্থাৎ দারিদ্র্য দূরীকরণের পরীক্ষায় পৃথিবীতে সাফল্য বেশি। চীনে ১৯৯০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৬১ শতাংশ, তা ২০১১ সালে হয়েছে ৬, বর্তমানে ৪ শতাংশ। পৃথিবীতে ১৯৯০ সালে প্রায় ১ দশমিক ৯ বিলিয়ন জনগণ দরিদ্র ছিল। বর্তমানে তা ৮৩৬ মিলিয়নে নেমেছে। সংখ্যার হিসাবে তা ৪৪ শতাংশ হলেও যেহেতু পৃথিবীর জনসংখ্যাও বেড়েছে, তাই তা এখন মোট জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ। ১৯৮১ সালে যেখানে পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ২৮ শতাংশ ছিল দক্ষিণ এশিয়ায়, ১৯৯১ সালে ছিল ৩১ শতাংশ, ২০০৫ সালে তা হয়েছে ৪৩ শতাংশ। বলা যায়, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক দরিদ্র পরিবারের আবাস দক্ষিণ এশিয়ায়। তা সত্ত্বেও দারিদ্র্য দূর করার সাফল্যগাথায় অবশ্য চীনের পরই দক্ষিণ এশিয়া। আর দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ সাফল্যের শীর্ষে। তবে চীনের কাছাকাছি আমরা পৌঁছাইনি। আমার ধারণা, আমাদের সবার রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের লক্ষ্য— বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করা। সম্ভব কি? তা নিয়ে আজকের আলোচনা।

দারিদ্র্যকে আমরা বলি অভিশাপ। কার? তা বলি না। আমার মতে, দারিদ্র্য কারো দেয়া অভিশাপ নয়। দারিদ্র্য আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার ফসল। তাই দারিদ্র্য দূর করাও সম্ভব। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন দ্বারাই এ ব্যাধি দূর করা যায়। আর এ লক্ষ্যে কাজ করছে অসংখ্য সংগঠন, সরকার এবং হাজার হাজার জনগণ, যারা নিজের সম্পদের একাংশ প্রতি বছর অবলীলায় দান করছে। কেউ করছে জাকাত হিসেবে, কেউ করছে মনের তাগিদে, কেউ করছে সমাজকে ভালোবেসে। আমাদের এ প্রচেষ্টা নতুন নয়। শত শত বছর আগে ধর্মীয় অনুশাসনেও বলা হয়েছে যে, দরিদ্রদের সাহায্য করা আল্লাহ বা ঈশ্বরকে ভালোবাসার অংশ। তা সত্ত্বেও দারিদ্র্য দূরীকরণে আমাদের সাফল্য সাম্প্রতিক। ১৯৭০ সালে আমাদের দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৯ বা তার কিছু বেশি, ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তা কমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৫৬ শতাংশে। তার মানে স্বাধীনতার প্রথম ২০ বছরে আমাদের অগ্রগতি যৎসামান্য। শুধু তাই নয়, দরিদ্র জনসংখ্যা এ সময়ে বেড়েছে অনেক গুণ। কারণ সাড়ে ৭ কোটির ৫৯ শতাংশ আর ১১ কোটির ৫৬ শতাংশের মধ্যে শেষেরটাই বড়।

স্বাধীনতা অর্জনের পর দারিদ্র্য দূর করার জন্য হাজার হাজার দেশী-বিদেশী সংস্থা সরকারের সঙ্গে কাজ করেছে বাংলাদেশে। তা সত্ত্বেও আমাদের মূল সাফল্য এসেছে '৯১-এর পর। এর আগে পর্যন্ত দারিদ্র্য দূরীকরণে আমাদের সাফল্য দেখার মতো নয়। এর অর্থ এই নয় যে, কেউ কাজ করেনি। সাহায্য কাজে লাগেনি। আমাদের বুঝতে হবে, দারিদ্র্য কীভাবে তৈরি হয়। কেন মানুষ গরিব হয় বা থাকে? কেন দারিদ্র্যের ফাঁদে মানুষ আটকে থাকে?

বেশ কিছুদিন আগের কথা। ইউরোপীয়দের সাহায্যে ইসলামিক রিলিফের একটি প্রজেক্ট দেখতে গিয়েছিলাম রংপুরে। আমার সঙ্গে আমার কয়েক শিক্ষার্থী। গ্রামের এক পাড়ায় দেখতে গিয়েছি, কাকে সাহায্য দিয়েছে সংস্থাটি। একপর্যায়ে জীর্ণ বস্ত্র পরনে এক মাঝ বয়সী নারী আমার কাছে এলেন। বললেন, 'স্যার, যারা এখানে সাহায্য পেয়েছে, তাদের চেয়ে আমি অনেক গরিব। কিন্তু আমি পাইনি।' চেহারা দেখে আমারও তা-ই মনে হলো। উপস্থিত অনেক নারী (যারা সাহায্য পেয়েছেন) জানালেন, সে আসলেই গরিব। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, তাকে সাহায্য করতে গিয়েও তারা করতে পারছে না। কারণ দরিদ্র পরিবারের যে সংজ্ঞা তাদের প্রজেক্টে আছে, তাতে সে পড়ে না। কেন? কারণ

লক্ষণীয় যে, আমাদের প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ অতিক্রম করার পরই দারিদ্র্যের হার ক্রমান্বয়ে নিচে নামতে শুরু করে। এ প্রবৃদ্ধির পেছনে রয়েছে অনেক পরিশ্রম, অনেক প্রচেষ্টা। তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা দারিদ্র্য দূরীকরণের অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। তবে প্রবৃদ্ধির ফাঁদও আছে। মধ্যম আয়ের দেশ মানে হলো, আমাদের আয় বেশ বড় অঙ্কের। আমাদের খরচও বেশ বড়। অথচ যেসব কারণে আমরা দরিদ্র হতে পারি, তা দূর করা অসম্ভব। তাই প্রয়োজন নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনার

সাহায্য দেয়ার স্থির কিছু নিয়ম দেয়া আছে। সব শর্তই ঠিক। কিন্তু একটি শর্ত মিলছে না তার জন্য। কী সেই শর্ত? তার স্বামী আছে। তখন নারী কেঁদে বললেন, 'স্বামী আছে, কিন্তু স্যার সে তো অচল।' প্যারালাইসিস হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। বুঝতেই পারছেন, কী করে পরিবারটি দরিদ্র হলো? পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তি দুর্ঘটনা কিংবা অন্য কোনো কারণে 'অচল' হয়ে পড়লে পরিবারটি দরিদ্র হয়। আমরা কি তা বন্ধ করতে পারব? পারব কি সব দুর্ঘটনা রোধ করতে? সম্ভব না।

আরো বহু কারণে পরিবার দরিদ্র হয়। যেমন— হঠাৎ করে নদীভাঙনে পরিবার দরিদ্র হয়ে যায়। ঢাকা শহরে বস্তিবাসীর এক বিরাট অংশ নদীভাঙনের শিকার। প্রায় ১৫ বছর আগের আমার এক গণনা অনুযায়ী, ১৭ শতাংশ বস্তিবাসী নদীভাঙনের ফলে ঢাকায় চলে এসেছে। আমরা কি পারব নদীভাঙন বন্ধ করতে? আমি একটি শিশুকে জানি, যার মা-বাবা দুজনেই খুন হয়েছে। সে এখন দরিদ্র একটি শিশু। আছে একটি আশ্রমে। কিংবা ধরুন চাকরিচ্যুত হয়ে বা ব্যবসায় বা শেয়ারে টাকা হারিয়েও অনেকে দরিদ্র হয়। আমি দেখেছি, প্রতারণার ফলে মানুষ দরিদ্র হয়। আরো আছে, কাজ না পেয়ে মানুষ দরিদ্র হয়। পরিবারের একটি শিশু যদি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগে, তাতেও মানুষ দরিদ্র হয়ে যায়। কারণ তখন অনেক মা চাকরি ছেড়ে শিশুটিকে সময় দেন। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণে আমাদের ভাবতে হবে সার্বিকভাবে। বিবাহবিচ্ছেদেও পরিবার দরিদ্র হয়ে যায়। তাই কেবল ক্ষুদ্রঋণ, গরু-ছাগল বিতরণ কিংবা নারী শিক্ষা দারিদ্র্য দূর করতে পারবে না। তবে এগুলোও চালু রাখা বা এর বিকাশের প্রয়োজন আছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণে আমাদের সাফল্যের শুরু ১৯৯১ সাল থেকে। তখন থেকে আমাদের গণতন্ত্রও শুরু। কাকতালীয় বলে অনেকে গণতন্ত্রকে দারিদ্র্য দূরীকরণের হাতিয়ার মনে করে ভুল করতে পারেন। আবার আশির দশকে আমাদের গ্রামীণ জনপদ সংযুক্ত হয়েছে শহরের সঙ্গে— এলজিইডির সড়ক তৈরির কারণে। ফলে বেড়েছে বাজারের আওতা। বেড়েছে আয়। একই সময়ে আমাদের গার্মেন্টে শিল্প বিকশিত হয়েছে। সব মিলিয়ে আমাদের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। নব্বইয়ের দশক কিংবা পরবর্তী সময়ে শত অনিশ্চয়তার মধ্যেও আমাদের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। লক্ষণীয় যে, আমাদের প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ অতিক্রম করার পরই দারিদ্র্যের হার ক্রমান্বয়ে নিচে নামতে শুরু করে। এ প্রবৃদ্ধির পেছনে রয়েছে অনেক পরিশ্রম, অনেক প্রচেষ্টা। তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা দারিদ্র্য দূরীকরণের অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। তবে প্রবৃদ্ধির ফাঁদও আছে। মধ্যম আয়ের দেশ মানে হলো, আমাদের আয় বেশ বড় অঙ্কের। আমাদের খরচও বেশ বড়। অথচ যেসব কারণে আমরা দরিদ্র হতে পারি, তা দূর করা অসম্ভব। তাই প্রয়োজন নতুন চিন্তা নতুন ভাবনার।

হতদরিদ্র জনপদের উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ ও সুইস সরকারের সাহায্যে গঠিত হয়েছে ইপিআরজি বা অতিদরিদ্র গবেষণা গোষ্ঠী। তারা প্রকাশ করেছে অতিদরিদ্রদের ইশতেহার। তাদের ধারণা, ২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। তারা বলছে, প্রয়োজন ছয়টি পদক্ষেপ। এক. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। দুই. দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সরকারি সহায়তা তহবিল যেমন— সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় আনা। তিন. জনগণকে অনিশ্চয়তা (দুর্ঘটনা বা দুর্যোগ জাতীয়) থেকে রক্ষা করা। চার. শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায় আনা। পাঁচ. নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা ও ছয়. সমাজের অচ্ছুত জনগোষ্ঠীকে সহায়তার আওতায় নিয়ে আসা। তাদের মতে, ছয়টি কাজ নিশ্চিত করার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করার চাবি।

সম্প্রতি আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেছেন, দেশ থেকে ২০১৯ সালেই দারিদ্র্য দূর হবে। অথচ কীভাবে তা হবে, এ নিয়ে কোনো স্পষ্ট ভাবনা দেখছি না। ভাষণ দিয়ে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে না কিংবা সেমিনার করেও তা সম্ভব হবে না। প্রয়োজন চিন্তাভাবনার। প্রয়োজন পদক্ষেপের। এ কারণেই অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে চাইলাম যে, দারিদ্র্য দূর করার জন্য প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ। এসব কাজ একা সরকার যেমন করতে পারবে না, তেমনি পারবে না এনজিওগুলোও। প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ। প্রয়োজন অর্থ সংস্থান। কোত্থেকে আসবে এই অর্থ। কেবল করদাতাদের ওপর ভর করা অসম্ভব হবে। আমার মতে, এ কাজে সরকারের উচিত জাতীয় কমিটি গঠন করা। আরো প্রয়োজন দুর্নীতি দূর করা। প্রয়োজন অর্থনীতির গতি বৃদ্ধি করা। প্রয়োজন জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা। প্রয়োজন জাতীয় বীমা ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। প্রয়োজন সামাজিক সচেতনা বৃদ্ধি করা। প্রয়োজন সামাজিক বঞ্চনা থেকে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করা।

লেখক : ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক
পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট